

গ্রান্ড ডিজাইন ইশ্বরবিহীন মহাবিশ্বে রূপরেখা

অভিজিৎ রায় ও অজয় রায়

2. THE GRAND DESIGN by Stephen Hawking & Leonard Mlodinow,
Bantam books, New York, September 2010,
Price \$ 28.00

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে
আমি মানব একাকী ভূমি বিস্ময়ে, ভূমি বিস্ময়ে
-রূবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বর্তমান কালের সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং ও তাঁর যোগ্য সহকর্মী লিওনার্ড ম্লোডিনো'র (Stephen Hawking & Leonard Mlodinow) হাত দিয়ে বেরিয়েছে মাত্র দুশো পৃষ্ঠার আর একটি সাড়া জাগানো বই- 'The Grand Design' বা চমকপ্রদ পরিনীরু। বাজারে বেরিয়েছে এই সেপ্টেম্বর তারিখে, ২০১০। তবে বাজারে বের

হওয়ার আগেই গত ২২ সেপ্টেম্বর তারিখে 'দ্য টাইমস' এ বইটির আগাম সংবাদ জানিয়ে শিরোনাম করেছিল - 'god did not create the Universe: Hawking' দ্য টাইমস আরও লিখেছে যা বাংলা অনুবাদে দাঁড়ায়:

স্টিফেন হকিং সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিতে মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে ঈশ্঵রের (God) কোন স্থান নেই। যেমনটি জীববিদ্যার ক্ষেত্রে জীব-সংজ্ঞে ডারউইন এই মহান ঈশ্বরকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। ব্রিটেনের শীর্ষ স্থানীয় বিজ্ঞানী হকিং যুক্তি দিয়ে তুলে ধরেছেন যে বিজ্ঞানের নতুনতম তত্ত্বসমূহে মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ঈশ্বরের ভূমিকা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক, অপ্রয়োজনীয় ও অবাস্তব। তাঁর প্রকাশিতব্য নতুন গ্রন্থটিতে, যার সারাংশ 'ইউরেকাতে', এবং আজ 'দ্য টাইমসে' প্রকাশ পেয়েছে, 'মহাবিশ্বের কি থয়েজন একজন সৃষ্টিকর্তা?- এই প্রশ্নে অধ্যাপক হকিংয়ের 'দৃঢ়' ও জোরালো উত্তর হচ্ছে, 'না'। কোটি কোটি ঘটনার মধ্যে বিস্ময়করভাবে ঘটা 'মহাবিস্ফোরণ' মহাপ্রপক্ষের ব্যাখ্যা কেবল চাস (chance phenomenon) বা আকস্মিকতার মাধ্যমে দেয়া যোতে পারে, অথবা কোন ঐশ্বরিক সত্ত্বার দ্বারাই এর ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব; কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই মহাবিস্ফোরণ হল পদার্থবিদ্যার নিয়মের অবশ্যিকাবী ফসল। একথা হকিং দৃঢ়তার সাথে বলেছেন- 'কারণ মহাকর্ষের মত নিয়ম রয়েছে, (পদার্থবিদ্যার) বিধি মতে শূন্য থেকে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হতে পারে এবং হবে। স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিই এর পশ্চাদ কারণ।'

বিস্তারে যাবার আগে লেখকদ্বয়ের সামান্য পরিচয় তুলে ধরা যাক সাধারণ পাঠকের জন্যে। ১. স্টিফেন হকিং হলেন ক্যাস্ট্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতশাস্ত্রের লুকাসিন অধ্যাপক (Lucasian Professor of Mathematics)- যে পদে তিনি গত ৩০ বছর ধরে অধিষ্ঠিত। তিনি অসংখ্য পুরক্ষারে ভূষিত হয়েছেন, সম্প্রতি পাওয়া সম্মান 'প্রেসিডেন্সিয়াল অব ফ্রিডম' তার অন্যতম। সাধারণ পাঠকের জন্য লিখিত বইগুলোর মধ্যে রয়েছে ক্লাসিক গ্রন্থ 'A Brief History of Time', Black Holes and Baby Universe and other essays, The Universe in a Nutshell, ইত্যাদি। তিনি মহাবিস্ফোরণ (Big Bang) তত্ত্বের প্রবক্তা। তাঁর ওয়েবে সাইট 'www.hawking.org.uk' থেকে তাঁর সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যেতে পারে। ২. লিওনার্ড ম্লোডিনো হলেন ক্যালটেকের পদার্থবিদ এবং জনপ্রিয় বইসমূহের- 'The Drunkard's Walk: How Randomness rules Our Lives, Euclid's Window: The story of Geometry from Parallel lines to Hyperspace, and Feynman's Rainbow: A Search for Beauty in Physics and in Life'... লেখক। The Star Trek: the Next Generation... এই শিরোনামে বিজ্ঞান কল্পকাহিনী সিরিজে লিখে থাকেন। তিনি দক্ষিণ পাসাডেনায়-

କ୍ୟାଲିଫେନ୍ରିଆ- ବାସ କରେନ । ତାଁର ଓଯେର ସାଇଟ ହଚେ
www.its.caltech.edu/~Len.

ଆଲୋଚନା ଶୁଣିର ଆଗେ ପ୍ରକାଶକ କୀଭାବେ ପ୍ରକଟିକେ ପାଠକଦେର
କାହେ ତୁଳେ ଧରେଛେ ସେଟି ଦେଖା ଯାକ :

The first Major work in nearly a decade by one of
the world's great thinkers - A marvelously
concise book with new answers to the ultimate
questions of life:

When and how did the universe begin? Why are
we here? Why is there something rather than
nothing? What is the nature of reality? Why are
the laws of nature so finely tuned as to allow for
the existence of beings like ourselves? And
finally, is the apparent "Grand design" of our
universe evidence of a benevolent creator who
set things in motion – or does science offer
another explanation?

The most fundamental questions about the
origin of the universe and of the life itself, once
the province of philosophy, now occupy the
territory where scientists, philosophers, and
theologian meet – if only to disagree. In their
new book, Stephen Hawking and Leonard
Mlodinow present the most recent scientific
thinking about the mysteries of the universe, in
non technical language marked by the brilliance
and simplicity.

In the Grand Design they explain that according
to quantum theory, the cosmos does not have
just a single existence or history, but rather
every possible history of the universe exists
simultaneously. When applied to the universe as
a whole, this idea calls into question the very
notion of cause and effect. But the 'top down'
approach to cosmology that Hawking and
Mlodinow describe would say that the fact the
past takes no definite form means that we
create history by observing it, rather than that
history creates us. The authors further explain
that we ourselves are the product of quantum
fluctuations in every early universe, and show
how quantum theory predicts the 'multiverse' –
idea that ours is one of many universes that
appeared spontaneously out of nothing, each
with different laws of nature.

‘ଆମାଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକେର ଅନ୍ତିତ୍ତାଇ
ଖୁବଇ କମ ସମୟେର ଜନ୍ୟ । ଆର ଏହି କ୍ଷଣିକେର
ଅନ୍ତିତ୍ତାଇ ଏହି ମହାବିଶ୍ୱେର ଖୁବ କମ ଅଂଶଇ
ଆମାଦେର ପକ୍ଷେ ଦେଖା ସମ୍ଭବ । କିନ୍ତୁ ମାନୁଷ
ସଭାବେ ଖୁବଇ କୌତୁଳୀ । ସେ ଜାନତେ ଚାଯ,
ସୀମାବନ୍ଦ ଜୀବନେର ଉତ୍ତର ଥୋଜେ । ଏହି
କୋମଳ-କଠୋର ପୃଥିବୀର ବୁକେ କ୍ଷଣିକେର ଜନ୍ୟ
ଜନ୍ୟ ନିଯେ ଉପରେର ସୁବିଶାଳ ମହାକାଶ ଆର
ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ଦେଖେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆମାଦେର ମତ
ମାନୁଷ ହାଜାରୋ ପ୍ରକ୍ଷଳ କରେ ଗେଛେ- ଏହି ଯେ
ମହାବିଶ୍ୱେ ଆମରା ଆଛି ଏକେ ବୋବାର ଉପାୟ
କି ? ଏହି ମହାବିଶ୍ୱେର ଆଚରଣ କେମନ ?
ବାନ୍ତବତାର ପ୍ରକୃତିଇ ବା କେମନ ? ସବକିଛୁ
କୋଥା ଥେକେ ଏଲୋ ? ମହାବିଶ୍ୱେର ସୃଷ୍ଟିତେ କି
କୋନୋ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାର ପ୍ରୟୋଜନ ଆଛେ ? ଆମରା
ବୈଶିର ଭାଗଇ ଏସବ ପ୍ରକ୍ଷଳ ନିଯେ ସାରାକ୍ଷଣ ମାଥା
ଧାମାଇ ନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକିଇ
କଥନୋନା କଥନୋ ଏସବ ପ୍ରକ୍ଷଳ
ନିଯେ ଚିନ୍ତା କରେ’ ।

Along the way Hawking and Mlodinow question
the conventional concept of reality, posing a
'model dependent' theory of reality as the best
we can hope to find. And they conclude with a
riveting assessment of M-theory, an explanation
of the laws governing us and our universe that is
currently the only viable candidate for a
complete 'theory of everything'. If confirmed,
they write, it will be the unified theory of
Einstein was looking for, and the ultimate
triumph of human reason.

ଆମରା ଏବାରେ ମୂଳ ଆଲୋଚନାଯ ପ୍ରବେଶ କରତେ ଚାଇ ।
ସିଟଫେନ ହକିଙ୍ ଓ ତାଁର ସହକରୀ ଲିଓନାର୍ଡ ମୋଦିନୋ ଖୁବ ସାହସୀ
ଏକଟା କାଜ କରେ ଫେଲେଛେଲେ - ଯେଠା ହକିଙ୍ଗେର ସଭାବେର ସାଥେ
ଏକଦମ ମେଲେ ନା । ତିମି ତାର ନତୁନ ବିଇ 'ଗ୍ରାନ୍ଟ ଡିଜାଇନ' ଏ
(Grand Design) ସରାସରି ବଲେଛେ- ମହାବିଶ୍ୱେ 'ସୃଷ୍ଟି'ର
ପେଛେ ଇଶ୍ୱରେର କୋନ ଭୂମିକା ନେଇ । ମହାବିଶ୍ୱେ ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନେର
ନିୟମ ନୀତି ଅନୁରଣ କରେ ସବୁକୁର୍ତ୍ତଭାବେ ତୈରି ହେଁଥେହେ ହକିଙ୍
ସାହସୀ କାଜଟା କରଲେନ ବଟେ- କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପାରଟି ତାର

স্বত্ত্বাবিরুদ্ধ। স্বত্ত্বাবের সাথে যায় না। বলার কারণ, হকিং তার পাঠকদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে ঠেলে দিয়ে ঈশ্বরকে নিয়ে মায়াবী কাব্য করতে পছন্দ করতেন। ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত তার বিপুল জনপ্রিয় বই- বিফ হিস্ট্রি অব টাইম (Brief History of Time) বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে ভরপুর, এমনকি শূন্য থেকে কী ভাবে মহাবিশ্ব প্রাক্তিকভাবেই উত্তৃত হতে পারে তারও সম্ভাব্য ধারণা আছে ওতে- কিন্তু বইয়ের শেষ লাইনটিতে এসেই প্যাডোরার বাস্তুর মতোই রহস্যের ঝাপি খুলে দিয়েছিলেন হকিং; বলেছিলেন- যেদিন আমরা সর্ববিষয়ের তত্ত্ব (Theory of every thing) জানতে পারব, সেদিনই আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে ‘ঈশ্বরের মন’কে (mind of god) পরিপূর্ণভাবে বোঝা [১]।

তারপর থেকে হকিং এর বলা এই ঈশ্বরের মন বা ‘মাইড অব গড’ নিয়ে হাজারো ব্যাখ্যা আর প্রতিব্যাখ্যা করা হয়েছে। কেউ বলেছেন ‘মাইড অব গড’ ব্যাপারটা হকিং তার বইয়ে কেবল কাব্যময় রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন, সত্যিকার ঈশ্বরকে বোঝাননি, আবার আরেকদল বললেন, ‘মাইড অব গড’-এর মাধ্যমে হকিং এক ধরনের ঈশ্বরের আনুষ্ঠানিক স্থীরতি দিয়েছেন। এতে নাকি প্রমাণিত হয়েছে যে বিশ্ব দরবারে ঈশ্বর বলে সত্যিই কিছু একটা আছে। তর্ক-বিতর্কে রঙমঞ্চ জমজমাট ছিলো পুরোটা সময়ই কিন্তু কোন সুনির্দিষ্ট সমাধানে কেউ পৌছতে পারেনি। ব্যাপারটির গুরুত্ব তুলে ধরতে জ্যোতির্গব্দী পল ডেভিস তো ১৯৯২ সালে একখানা ঢাউস বই লিখে ফেলেছেন ‘মাইও অব গড’ শিরোনামে [২]। তবে হকিং কথিত ‘মাইও অব গড’ এর অঙ্গনিহিত তাংপর্য কি ছিলো, এর দ্বারা কি কি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে- তা শুধু হকিং এর মন্তিক বলতে পারে। তবে কেউ কেউ আবার বললেন, হকিং ‘মাইও অব গড’ নিয়ে অনর্থক ধোঁয়াশা সৃষ্টি করেছিলেন তার প্রথম বইয়ের পার্বলিসিটি তথা প্রচারের স্বার্থে। ঐ ‘মাইও অব গড’ নামক একটি বাক্যবক্ষের জন্যই নাকি বইয়ের কাটতি বেড়ে গিয়েছিলো বিশঙ্গণ! তবে যতই আকর্ষণীয় শোনাক না কেন, এগুলো সবই অনুমানের গয়না-বাস্তুই সীমাবদ্ধ থাকবে।

অবাক ব্যাপার হচ্ছে এবারে কিন্তু এই ‘ধরি মাছ না ছাঁই পানি’ অবস্থান থেকে পুরোপুরি সরে এসেছেন হকিং। তার নতুন বই ঘাও ডিজাইনে খুব চাঁচাছোলা ভাবে বলেছেন (পৃষ্ঠা ১৮০)-

‘মধ্যাকর্ষণ শক্তির সূত্রের মতো পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র কার্যকর রয়েছে, তাই একদম শূন্যতা থেকেও মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্ভব এবং সেটি অবশ্যভাবী। ‘স্বতঃকৃতভাবে সৃষ্টি’ হওয়ার কারণেই ‘দেয়ার ইজ সামর্থিং, র্যাদার দ্যান নাথিং’, সে কারণেই মহাবিশ্বের অস্তিত্ব রয়েছে, অস্তিত্ব রয়েছে আমাদের। মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময় বাতি জ্বালানোর জন্য ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন নেই।’

হকিং তার এই নতুন বইটি লিখেছেন ক্যালটেক বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানী লিওনার্ড প্লাভিনের সাথে মিলে, এবং এটি বেরিয়েছে ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। যে দিন বইটি বাজারে আসে (সেপ্টেম্বর ৭, ২০১০), সে দিনই বইটি আমরা পেয়ে যাই।

হকিং এর নতুন বইটি খুব বেশি বড় নয়। ২০০ পৃষ্ঠারও কম। নিবিট মনে পড়লে দু দিনের মধ্যেই শেষ করে ফেলা যায় টিলেমি করে পড়লেও এক সপ্তাহের বেশি লাগার কথা নয়। বিভিন্ন লেখার জন্য বার কয়েক পড়তে হয়েছে আমাদের। শুধু আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ক্ষেত্রেই নয়, দর্শনের ক্ষেত্রেও আছে রীতিমত চমক বইটিতে। এই বইয়ের প্রতিটি লাইনই পাঠককে চিন্তাশীল করবে, প্রলুক্ষ করবে আরও জানতে, পরিশীলনী করবে নতুন জ্ঞানের সমীরণে। মোট আটটি অধ্যায়ে সাজানো এই ছেট বইটি। বইয়ের অধ্যায়গুলোর বাংলা করলে অনেকটা শোনাবে এ রকমের -‘অস্তিত্বের রহস্য’, ‘নিয়মের মীতি’, ‘বাস্তবতা কী?, ‘বিকল্প ইতিহাস’, ‘সার্বিক তত্ত্ব’, ‘আমাদের মহাবিশ্ব নির্বাচন’, ‘আপাতঃঅলোকিততা’ এবং সর্বশেষ অধ্যায়টি-‘গ্র্যাণ্ড ডিজাইন’।

এই শেষ অধ্যায়টির নামেই পুরো বইটির নামকরণ করেছেন হকিং এবং প্লাভিনো। বইয়ের নাম শুনে প্রথম ধাক্কায় কারো কারো মনে হতে পারে বুদ্ধিমত্তা অনুকূল বা ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনকে প্রমোট করা কোন বই বোধ হয়। কিন্তু বইটি হাতে পাবার পর সংশ্য কাটতে সময় লাগে নি। না, বইটি ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের কোন বই নয়, নয় কোন ছবিবেশী পরিকল্পনাকারী অস্তিত্বের বিজ্ঞানময় প্রচার; বরং বইটি নিখিল বিজ্ঞানেরই বই। বইয়ের শিরোনামটা আমাদের কাছে মজার এক কৌতুককর বলেই শেষ পর্যন্ত ধরা দিয়েছে। অবশ্য গৃহ বিষয় নিয়ে হকিং এর ‘অনর্থক’ কৌতুক করার ব্যাপারটি নতুন নয়। বিষয়টি নজরে পড়েছে ক্যালিফোর্নিয়া ইনসিটিউট অব টেকনোলজির স্বনামখ্যাত পদার্থবিদ এবং সুলেখক শন ক্যারলেরও। হকিং এর বইয়ের রিভিউ করতে গিয়ে সেজন্য ড. ক্যারল প্রথমেই লিখেছেন [৩]-

[হকিং এর] বইয়ের শিরোনামে ‘ডিজাইন’ শব্দটির ব্যবহার লেখকের সেই চতুর কৌতুকপ্রিয় মননকে তুলে ধরেছে, যার সাথে আমরা ইতোমধ্যে সম্যকভাবে অবহিত হয়ে গেছি। না, মহাবিশ্বের বিবিধ ধাঁধার সমাধান করতে গিয়ে লেখকের উভরের সাথে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন কিংবা ধর্মীয় মতবাদের কোনই সম্পর্ক নেই।

হকিং- প্লাভিনো তাদের বইটির প্রথম অধ্যায়ের নাম রেখেছেন ‘অস্তিত্বের রহস্য’। আমাদের অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত অস্তিত্ব

সমস্ত প্রশ্নের প্রসরা সাজিয়ে অধ্যায়টি শুরু করেছেন তারা।
অধ্যায়টি শুরু হয়েছে এভাবে [৪] (পৃ. ৫)।

“আমাদের প্রত্যেকের অস্তিত্বই খুবই কম সময়ের জন্য। আর এই ক্ষণিকের অস্তিত্বে এই মহাবিশ্বের খুব কম অংশই আমাদের পক্ষে দেখা সম্ভব। কিন্তু মানুষ স্বত্বাবে খুবই কৌতুহলী। সে জানতে চায়, সীমাবদ্ধ জীবনের উত্তর খোঁজে। এই কোমল-কঠোর পৃথিবীর বুকে ক্ষণিকের জন্য জন্ম নিয়ে উপরের সুবিশাল মহাকাশ আর নক্ষত্রপুঁজি দেখে যুগে যুগে আমাদের মত মানুষ হাজারো প্রশ্ন করে গেছে- এই যে মহাবিশ্বে আমরা আছি একে বোঝার উপায় কী? এই মহাবিশ্বের আচরণ কেমন? বাস্তবতার প্রকৃতিই বা কেমন? সবকিছু কোথা থেকে এলো? মহাবিশ্বের সৃষ্টিতে কি কোনো সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন আছে? আমরা বেশির ভাগই এসব প্রশ্ন নিয়ে সারাক্ষণ যাথা ঘায়াই না, কিন্তু প্রায় প্রত্যেকেই কখনো না কখনো এসব প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করে’।

প্রথম অধ্যায় থেকে শুরু করে পুরো বইটি জড়েই হকিং সেই সমস্ত কঠিন প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে গেছেন যেগুলো আমাদের অস্তিত্বের সাথে জড়িত শুধু নয়, সাম্প্রতিক সময়ে আধুনিক বিজ্ঞান এবং দর্শনের প্রাণিক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। যেমন,

- কেন কোনো কিছু না থাকার বদলে কিছু আছে?
- বা আমাদের অস্তিত্ব আছে কেন?
- কেন ভৌত সূত্রগুলো যেমনটি দেখায় সেরকম, অন্যরকম নয় কেন?

গ্রহকারণ্য যথার্থ পদার্থবিজ্ঞানীর চেখ দিয়ে সমস্যাগুলোকে বিবেচনা করেছেন এবং দাবি করেছেন এই প্রশ্নগুলো অতীতে দর্শনের কিংবা ধর্মশাস্ত্রের এখতিয়ারে বিবেচিত হলেও আজ তা আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানেরই অনুসরিংসার অংশ। তাঁরা দাবি করেছেন, আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমেই উপরের প্রশ্নগুলোর অস্তিম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়- কোন ধরনের ঐশ্বরিক কিংবা অপার্থিব অনুকল্প ব্যতিরেকেই।

- বইটির নিয়মের নীতি (The rule of Law) শিরোনামের ২য় অধ্যায়টির বেশ কিছু অংশ জুড়ে পদার্থ বিজ্ঞানের স্তুত বলতে কী বোঝায়, কীভাবে সেগুলো উত্তৃত হতে পারে তা নিয়ে প্রাঞ্জল আলোচনা রয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম বা সূত্রগুলো নিয়ে স্টিফেন হকিং এবং ম্লেডিনো যে সমস্ত প্রাণিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন সেগুলো হল-
- নিয়মগুলো কীভাবে উত্তৃত হল?
 - নিয়মগুলোর কি কোন ব্যতিক্রম আছে?
 - নিয়মগুলোর কি একটিই সম্ভাব্য দল (Set) আছে?

অন্যতম। প্রাকৃতিক নিয়ম জিনিসটি কী তা বোঝাতে অধ্যায়টি শুরু করা হয়েছে সূর্যগ্রহণ দিয়ে। প্রাচীন কালের মানুষেরা বহুদিন ধরেই সূর্যগ্রহণ ব্যাপারটার সাথে পরিচিত ছিলেন। বছরের পর বছর দেখতে দেখতে তারা একসময় উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ এগুলো ইতস্ততভাবে ঘটে না, বরং ঘটে কিছু নিয়মে চলা ছক অনুসরণ করে। এভাবেই শুরু হয়েছিল মানুষের প্রাকৃতিক নিয়মকে বোঝার নিরন্তর প্রক্রিয়া। তারপর এসেছে থেলসের (Thales) কথা- যিনি দু'হাজার ছ'শো বছর আগে ভাবতে পেরেছিলেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলছে কিছু নিয়মের উপর ভর করে। থেলস ছাড়াও অধ্যায়টিতে ক্রমান্বয়ে এসেছে পিথাগোরাস, আনাঞ্জিমেণ্টার, এম্পিডিওক্লিস, হিপোক্রেটিস, অ্যানাঞ্চোগোরাস, ডিমোক্রিটাস, অ্যারিস্টার্কাসহ অন্যান্য আয়োনীয়দের ইতিহাসকথন। গ্রহকারণ্য দু'জন ইতিহাসের বিভিন্ন কালকে, ঘটনাপ্রবাহকে সুসাহিত্যিকের মত বর্ণনা করে গেছেন, তাঁরা শুধু বিজ্ঞানেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, তুলে এনেছেন আয়োনীয় সভ্যতার আলোকিত ইতিহাস, কখনো চলে গেছেন কেপলার, দেকার্তে, নিউটন, গ্যালিলিওর সময়, কখনো বা আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের অতি সাম্প্রতিককালের লক্ষ জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানের ইতিহাসকে তুলে এনেছেন অনাবিল স্বাচ্ছন্দ্য। আর এই অধ্যায়টি হয়ে উঠেছে বইয়ের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অধ্যায়গুলোর একটি। অধ্যায়টি পড়তে পড়তে কেন যেন জীবনান্দ দাসের সুচেতনা কবিতাটির দু'চরণ আমাদের মনে পড়ছিল।

আমাদের পিতা বৃক্ষ কনফুশিয়াসের মতো আমাদেরও প্রাণ মৃক করে রাখে; তবু চারিদিকে রক্তক্লান্ত কাজের আহ্বান। সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেল এ পথেই পৃথিবীর ত্রমমুক্তি হবে;

সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ...

হকিং-ম্লেডিনোর এই বইয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং বিস্তৃত প্রেক্ষাপট হল আধুনিক কোয়ান্টাম বলবিদ্যার গভীর এবং সাবলীল ব্যাখ্যা। আর, এই ব্যাখ্যাগুলোকে সাধারণ পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হয়েছে কোন ধরনের গাণিতিক সমীকরণের ব্যবহার ছাড়াই। রিচার্ড ফেইনমেনের কোয়ান্টাম বলবিদ্যার প্রচলিত নিয়মকে (যেটিকে ফেইনমেন অভিহিত করতেন ইতিহাসের মোগ বা Sum of historical fact নামে) ব্যাখ্যা করেছেন বিস্তৃত পরিসরে। একটা মজার বিষয় এখানে না বললেই নয়। হকিং-ম্লেডিনোর এই বইয়ে ফেইনমেনকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে ক্যালটেকের একটি স্ট্রিপ ক্লাবের বঙ্গোবাদক হিসেবে, নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী হিসেবে নয়। এটা অবশ্য ফেইনমেনকে খাটো করার জন্য নয়, বরং ফেইনমেনের ব্যতিক্রমী চরিত্র পাঠকদের সামনে তুলে ধরতেই এই কাজটি তাঁরা করেছেন। কোতুকপ্রিয় হকিং। সে যাই হোক, ফেইনমেন তার কোয়ান্টাম বলবিদ্যা নিয়ে

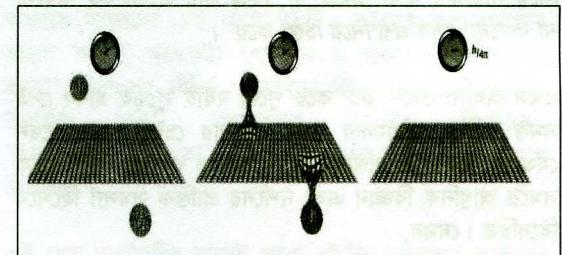
ଗବେଶନା ଦେଖିଯେଛେ, ଏକଟି କଣାର କେବଳ ଏକଟିଇ ଇତିହାସ ଥାକେ ନା, ଥାକେ ବିଭିନ୍ନ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଇତିହାସେର ସମାହାର, ଅର୍ଥାଏ ଗାଣିତିକଭାବେ - ଅସଂଖ୍ୟ ସଂକାର୍ଯ୍ୟର ଅପେକ୍ଷକ । ଆମରା କଣାର ଘିଚିଡ଼ ବା ଡବଲ ସ୍ଟିଟ ଏକ୍ସପ୍ରେରିମେନ୍ଟ ଥିକେ ବ୍ୟାପାରଟାର ସତ୍ୟତା ଜେନେହି । ଠିକ୍ ଏକଇ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରେ ତାରା ଦେଖିଯେଛେ ଯେ, ଏହି ଅଞ୍ଚତୁରେ ବ୍ୟାପାରଟା ଆମାଦେର ମହାବିଶ୍ୱେର ଜନ୍ୟ ଓ ଏକଇଭାବେ ସତ୍ୟ । ମହାବିଶ୍ୱେର କେବଳ ଏକକ ଇତିହାସ ଆହେ ମନେ କରଲେ ତୁଲ ହବେ-କାରଣ ଆଧୁନିକ ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନୀଦେର ଧାରଣା, ମହାବିଶ୍ୱେର କୋଯାନ୍ଟାମ ଫ୍ଲାକଚୁଯେଶନେର ମାଧ୍ୟମେ କୋଯାନ୍ଟାମ ଶର ଥେକେଇ ଯାତ୍ରା ଶୁରୁ କରେହେ ଆର ଆମାଦେର ମହାବିଶ୍ୱେର ନିଯମଗୁଲୋ ଉତ୍ସୁତ ହେଁବେ ମହାବିଶ୍ୱେରଙ୍କେ ଫଳଶ୍ରୁତିତେଇ । ଏକଟି ଉତ୍ସୁତ-

ମତବାଦ; ବିଜ୍ଞାନୀରା କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରିକଭାବେଇ ଏର ପ୍ରମାଣ ପେଇଯେଛେ । ଏକଟି ପ୍ରମାଣ ହଚେ ‘ଲ୍ୟାସ ଶିଫ୍ଟ’, ଯା ଆହିତ ପରମାଣୁର ମଧ୍ୟାଙ୍କ୍ରିୟା ଦୁଟୋ ଶରେ ଶକ୍ତିର ତାରତମ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ । ତବେ କୋଯାନ୍ଟାମ ଫ୍ଲାକଚୁଯେଶନେର ସବଚେଯେ ଜୋରଦାର ପ୍ରମାଣ ପାଓୟା ଗେହେ ବିଖ୍ୟାତ ‘କାସିମିରେର ପ୍ରଭାବ’ ଥିକେ । ୧୯୪୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ଡାଚ ପଦାର୍ଥବିଦ ହେନରିଖ କାସିମିର ବଲେଛିଲେ, କୋଯାନ୍ଟାମ ଫ୍ଲାକଚୁଯେଶନ ସତ୍ୟ ହେଁ ଥାକଲେ ଦୁଟୋ ଧାତବ ପାତ ଖୁବ କାହାକାହି ଆନା ହେଲେ ଦେଖା ଯାବେ ତାରା ଏକ ଅନ୍ୟକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକର୍ଷଣ କରେହେ । ଏର କାରଣ ହଚେ, ଧାତବ ପାତଙ୍ଗଲୋର ମଧ୍ୟକାର ସଂକିର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଟିତେ ଭ୍ୟାକୁଯାମ ଫ୍ଲାକଚୁଯେଶନେର ଫଳେ ଖୁବ ଉଚ୍ଚ କମ୍ପାକ୍ଟେର ତଡ଼ିତ ଚୌଷକ ‘ମୋଡ’-ଏର ଉତ୍ସବ ସଟେ ଯା ଧାତବ ପାତଙ୍ଗଲୋକେ ଏକ ଅପରେର ଦିକେ ଆକର୍ଷଣେ ବାଧ୍ୟ କରେ । ଏ ବ୍ୟାପାରଟିଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟେ ମାର୍କ୍ସ ସ୍ପ୍ୟାର୍ଟେ, ସିଟିଭ ଲେମୋରାକ୍ସ ପ୍ରମୁଖ ବିଜ୍ଞାନୀଦେର ପରୀକ୍ଷାଯା ପ୍ରମାଣିତ ହେଁ ।

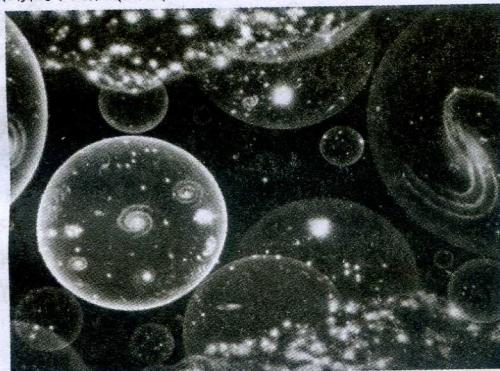
ଆମରା ଘିଚିଡ଼ ପରୀକ୍ଷାର ସାହାଯ୍ୟ କୋଯାନ୍ଟାମ ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନେର ଏକଟା ଚିତ୍ର ତୁଲ ଧରେହି । ଆମରା କୋଯାନ୍ଟାମ ବଲ୍‌ବିଦ୍ୟାର ଏହି ଫେଇନମେନ୍ଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଯୋଗ କରେ ଦେଖାବେ ଯେ, ଏକଟା କଣିକାର ମତୋ, ଏହି ମହାବିଶ୍ୱେରେ ଓ କୋନୋ ଏକକ ଇତିହାସ ନେଇ, ବରଂ ରଯେହେ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଇତିହାସେର ସମାହାର, ଏତିହାସିକ ଘଟନାଗୁଲୋର ପ୍ରତିଟିର ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଆହେ । ଏବଂ ମହାବିଶ୍ୱେର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଶ୍ରାନ୍ତ ଉପର ଆମାଦେର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ତାର ଅତୀତକେ ପ୍ରଭାବିତ କରାର ମାଧ୍ୟମେ, ଏହି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଇତିହାସକେ ନିର୍ଧାରଣ କରେ । ଠିକ୍ ଯେମନ୍ତ ଘିଚିଡ଼ ପରୀକ୍ଷାତେ ଯେଥାନେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଣିକାଟିର ଅତୀତକେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ଆର ଏସବ ବିଶ୍ୱେବନେର ମାଧ୍ୟମେ କୀତାବେ ଜଡ଼ କଣିକା ସୃଷ୍ଟି ହେଁ ତା ନିଯେ ବିଶଦଭାବେ ବଲା ହେଁବେ... ।

ଶୁଣ୍ୟ ଥେକେ ମହାବିଶ୍ୱେର ଉତ୍ସବେର ଧାରଣାଟି ଅବଶ୍ୟ ନତୁନ କିଛି ନନ୍ଦ । ବେଶ କିଛଦିନ ଧରେଇ ଏହି ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନେର ମୂଳଧାରାର ଗବେଶନର ଅନୁଭୂତ ହିସେବେ ବିଜ୍ଞାନୀରା ଏକେ ବିବେଚନା କରଛେ । ଅଭିଜିନ୍ ରାଯେର ପ୍ରଥମ ବିହି ‘ଆଲୋ ହାତେ ଚଲିଯାଇଛେ ଆଁଧାରେର ଯାତ୍ରୀ’ (୨୦୦୫) ବିହିଟିତେ ତଥାକଥିତ ଶୁଣ୍ୟ ଥେକେ କୀତାବେ ଜଡ଼ କଣିକା ସୃଷ୍ଟି ହେଁ ତା ନିଯେ ବିଶଦଭାବେ ବଲା ହେଁବେ । [୫] । କୋଯାନ୍ଟାମ ତତ୍ତ୍ଵାନ୍ୟାଯୀ ଶୂନ୍ୟତାକେ ଅନେକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟବ୍ରତ ବଲେ ମନେ କରା ହେଁ । ଶୂନ୍ୟତା ମାନେ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥେ ଶୁଣ୍ୟ ନନ୍ଦ- ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀଦେର ମତେ ଯେ ଶୁଣ୍ୟଦେଶକେ ଆପାତଃଦୃଷ୍ଟିତେ ଶାନ୍ତ, ସମାହିତ ମନେ ହେଁ ତାର ସୂକ୍ଷମତରେ ସବସମୟରେ ନାନାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟେ ଚଲେହେ । ଏର ମଧ୍ୟେ ନିହିତ ଶକ୍ତି ଥେକେ ପଦାର୍ଥକଣା ସ୍ଵତଃକ୍ରିୟାତ୍ମକଭାବେ ତୈରି ହଚେ, ଆବାର ତାରା ନିଜେରେକେ ସେଇ ଶକ୍ତିତେ ବିଲୀନ କରେ ଦିଜେହେ । ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିର ମୂଳେ ରଯେହେ ‘ରହ୍ୟମୟ’ କୋଯାନ୍ଟାମ ଫ୍ଲାକଚୁଯେଶନ ବା ତଥାକଥିତ ‘ଜିରୋ ପମେଟ ଏନାର୍ଜି’ । ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଦାର୍ଥ ଓ ପ୍ରତିପଦାର୍ଥ ଯୁଗଲେର ଆକାରେ ଯେ ଅସଦ କଣିକା (Virtual particle) ପ୍ରତିନିଯତ ତୈରି ହଚେ ତା ହାଇଜେନବାରେର ଅନିଶ୍ୟତା ତତ୍ତ୍ଵ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକବକେର ପରିସୀମାର ମଧ୍ୟେ ବିଲୀନ ହେଁ ଯାଏ ।

ବିଜ୍ଞାନୀରା ଆଜ ମନେ କରେନ, କୋଯାନ୍ଟାମ ଫ୍ଲାକଚୁଯେଶନେର ‘ରହ୍ୟମୟ’ ବ୍ୟାପାରଗୁଲୋ କଣାର କ୍ଷେତ୍ରେ ଯେମନିଭାବେ ସତ୍ୟ, ଠିକ୍ ତେମନିଭାବେ ମହାବିଶ୍ୱେର ଜନ୍ୟ ଓ ଏକଇରକମଭାବେ ସତ୍ୟ ହତେ ପାରେ । ତାରା ମନେ କରେନ ଏକ ସୁଦୂର ଅତୀତ କାରଣବିହିନ କୋଯାନ୍ଟାମ ଫ୍ଲାକଚୁଯେଶନେର (Quantum fluctuation) ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱବର୍କ୍ଷାଣେର ସୃଷ୍ଟି ହେଁଛିଲେ, ଯା ପରବର୍ତ୍ତୀତେ ସୃଷ୍ଟି ମହାବିଶ୍ୱେକେ ଶୀତିର (Inflation) ଦିକେ ଠେଲେ ଦିଯେଛେ, ଏବଂ ଆରୋ ପରେ ପଦାର୍ଥ ଆର କାଠାମୋ ତୈରିର ପଥ ସୁଗମ କରେହେ । ଏଗୁଲୋ କୋନ ବାନାନୋ ଗଲ୍ଲ ନନ୍ଦ । ମହାବିଶ୍ୱେ ଯେ ଶୁଣ୍ୟ ଥେକେ ଉତ୍ସବ ହତେ ପାରେ ଥର୍ମଏ ଏ ଧାରଣାଟି ବ୍ୟକ୍ତ କରେଛିଲେ ଏତୋଯାର୍ଡ ଟ୍ରିଯନ ୧୯୭୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ନାମକ ବିଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜାର୍ନାଲେ [୭] । ଏର ପର ଆଶିର ଦଶକେ ଶୀତି ତତ୍ତ୍ଵର



আবির্ভাবের পর থেকেই বহু বৈজ্ঞানি প্রাথমিক কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের ধারণাকে স্ফীতি তত্ত্বের সাথে জড়ে দিয়ে মডেল বা রূপকল্প নির্মাণ করেছেন [৮]। শুন্য থেকে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির ধারণা যদি অবৈজ্ঞানিক এবং আন্তর্ভুক্ত হত, তবে সেগুলো প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক সাময়িকীগুলোতে কখনোই প্রকাশিত হত না। মূলত স্ফীতি-তত্ত্বকে সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু পরীক্ষার মুখোয়াধি হতে হয়েছে, এবং এ পর্যন্ত প্রায় সবগুলোতেই এই তত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে [৯]। স্ফীতি তত্ত্ব গ্যালাক্সি ও ক্লাস্টারিং, এবং রশ্মি এবং অবলোহিত তেজক্ষিয়তার বিন্যাস, মহাবিশ্বের প্রসারণের হার এবং এর বয়স, মহাবিশ্ব গঠনে এর উপাদানগুলোর প্রাচৰ্য- সব কিছুই ব্যাখ্যা করতে পেরেছে নিখুঁত সৌন্দর্যে। অভিজিৎ রায় এর কারিগরী দিকগুলো নিয়ে বিস্তৃতভাবে মুক্তমনায় একটা লেখা লিখেছিলেন- ‘স্ফীতি তত্ত্ব এবং মহাবিশ্বের উন্নত’ শিরোনামে [১০]। সম্প্রতি রায়হান আবীরও মুক্তমনায় প্রকৃতিক উপায়ে মহাবিশ্বের উৎপত্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে একটা প্রবন্ধ লিখেছেন-[১১]। প্রবন্ধগুলোতে প্রাকৃতিকভাবে কীভাবে মহাবিশ্বের সূচনা হতে পারে তার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা ছাড়াও এর অস্তিত্বের পেছনে একটি আদি ঐশ্বরিক কারণের খণ্ডন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনের অলৌকিকতা খণ্ডন ছাড়াও পদার্থের উৎপত্তি এবং শৃঙ্খলার সূচনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।



চিত্র-২: হকিং এর মতে, কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে অসংখ্য মহাবিশ্ব স্থান-কালের শূন্যতার ভিতর দিয়ে আবির্ভূত হয়েছে, এদের মধ্যে কোন কোনটি হয়তো ত্রাস্তীয় আকাশে পৌছুতে পেরেছে এবং তারপর অতিস্ফীতিয় প্রসারণে ত্রুমাস্থে ছায়াপথ, তারকামণ্ডলী- এবং নিদেন পক্ষে অন্তত একটি ক্ষেত্রে আমাদের গ্রহের মতো পরিবেশে জীবনের উন্নত ঘটিয়েছে।

সংখ্যাস্থ মহাবিশ্ব সমক্ষে বইটি থেকে উদ্ভৃত করা যাব (পঃ-৮) :এম তত্ত্ব অনুযায়ী, আমাদের মহাবিশ্বই কেবল একটি মাত্র মহাবিশ্ব নয়। বরং এম তত্ত্ব ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে, অগণিত মহাবিশ্বের উন্নত ঘটেছে শ্রেফ শূন্য থেকে। আর এর পেছনে ইশ্বর কিংবা এ ধরনের কোন অপ্রাকৃত স্তরের হস্তক্ষেপের দরকার নেই।

হকিং অবশ্য এখানেই থেমে থাকেননি, আরো বহুদূর এগিয়ে গিয়ে স্ট্রিংতাত্ত্বিকদের দেয়া ‘এম থিওরী’র সাথে ফ্লাকচুয়েশনের একটি যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। এই সেই এম তত্ত্ব থেকে আমরা জেনেছি যে, আমাদের এই চিরপরিচিত বিশাল মহাবিশ্বের বাইরেও এমনি ধরনের অসংখ্য মহাবিশ্ব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এবং, বলা বাহ্যল্য, এগুলোর সবগুলোই উদ্ভৃত হয়েছে প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এটিই হচ্ছে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের মালটিভার্স বা অন্ত সংখ্যক মহাবিশ্বের ধারণা।

শুধু অন্তসংখ্যক মহাবিশ্বের ধারণা পাঠকদের সামনে হাজির করেই ক্ষান্ত হননি হকিং, পাশাপাশি গণনা করে দেখিয়েছেন ‘অসংখ্য মহাবিশ্বের’ সম্ভাব্য সংখ্যাও। সে সমস্ত ভিন্ন মহাবিশ্বে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রের ধরনও ভিন্ন হতে পারে বলে হকিং মনে করেন। তার মতে (পঃ- ১১৮)

এম তত্ত্বের নিয়মগুলো তাই ভিন্ন ভিন্ন মহাবিশ্বের অস্তিত্বের ধারণাকে সম্ভাব্য করে তুলে। মহাবিশ্বগুলোর প্রকৃতি কী রকম হবে তা নির্ভর করবে অন্তঃস্থানের বক্রতার প্রকৃতির উপর। কাজেই এম তত্ত্ব থেকে পাওয়া সমাধান অসংখ্য মহাবিশ্ব থাকার সম্ভাবনা তৈরি করেছে, তার সংখ্যা হতে পারে এমনকি 10^{100} টির। এর মানে হলো, আমাদের চারপাশে 10^{100} টির মতো মহাবিশ্বের অস্তিত্ব রয়েছে, এবং প্রতিটি চলতে পারে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক সূত্র দিয়ে।

ব্যাপারগুলোকে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর মতো শোনালেও বৈজ্ঞানিরা আজ মনে করছেন, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান যখন একেবারে শূন্য থেকে কেবল একটি নয়, অসংখ্য মহাবিশ্ব সৃষ্টির একটি প্রাকৃতিক এবং যৌক্তিক সমাধান দিতে পারছে, তখন ঈশ্বর সম্ভবত একটি ‘বাড়তি অনুকল্প’ ছাড়া আর কিছু নয়। বৈজ্ঞানি ভিট্টের স্টেপস, লরেস ক্রাউস, এলেন গুথ, আদ্বে লিডেরো সেটা অনেক আগে থেকেই বলে আসছিলেন [১২]। হকিংও শেষ পর্যন্ত সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। ‘গড় হাইপোথিসিস’ বা ‘ঈশ্বর অনুকল্প’ মোটা দাগে অক্ষমের ক্ষুরের পরিষ্কার লংঘন। তিনি নিজেই সেটা বলেছেন বইয়ের সবচেয়ে আলোচিত উদ্ভৃতির মাধ্যমে-

‘It is not necessary to invoke God to light the blue torch paper and set the universe going’

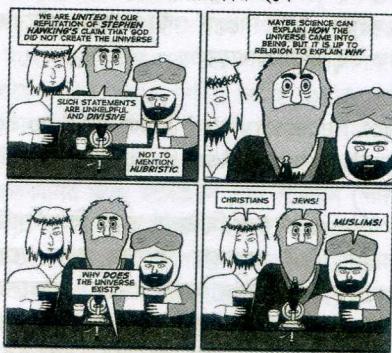
স্টিফেল হকিং এর বক্তব্য মিডিয়ায় তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি করেছে, বলাই বাহ্যল্য। এই লাগাতার বিতর্কের সূচনা হয়েছিল তার বই প্রকাশের এক সপ্তাহ আগে থেকে। লসনের টাইমস পত্রিকা তার প্রকাশিতব্য নতুন বইটির ফিচার করতে গিয়ে বইয়ের কিছু অংশ প্রকাশ করে সেপ্টেম্বর মাসের দুই তারিখে। হ্যানা ডেভলিনের রিপোর্টে প্রকাশিত টাইমসের সেই নিবন্ধের

শিরোনাম ছিলো- ‘God did not create the universe, says Hawking’ [১৩]। সেখান থেকেই নতুন বইয়ে বিশ্বত ঈশ্বর সম্বন্ধে হকিং এর পরিবর্তিত ধারণা পাঠকদের সামনে উঠে আসে। টাইমসে প্রকাশিত সেই অংশবিশেষে হকিংকে উদ্বৃত করে লেখা হয়েছিল- বিগ ব্যাং কোন স্বর্গীয় হাতের ফসল কিংবা ফুক ছিলো না। পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র মেনেই প্রাকৃতিকভাবে বিগ ব্যাং এর মাধ্যমে অনিবার্যভাবে শূন্য থেকে মহাবিশ্ব উত্তৃত হয়েছে; আর সেই সাথে সমাপ্তি ঘটেছে মহাবিশ্ব তৈরির পেছনে ঈশ্বরের ভূমিকার।



চিত্র-৩ : ‘ঈশ্বর মহাবিশ্ব তৈরি করেনি’ -২ৱা সেপ্টেম্বর লন্ডন টাইমসে প্রকাশিত কলামের শিরোনাম।

ধার্মিকেরা স্বভাবতই আশাহত হয়ে গালাগালির তুবড়ি ছুটিয়ে চলেছেন খবরটি প্রকাশের পর থেকেই তারা একজোট হয়ে স্টেটমেন্ট দিতে শুরু করেছিলেন তাদের মহাপতন ঠেকাতে। তারা বলছেন, মহাবিশ্ব কীভাবে শূন্য থেকে তৈরি হতে পারে বিজ্ঞান না হয় এখন তা ব্যাখ্যা করতে পারে, কিন্তু কেন মহাবিশ্বের সৃষ্টি তা নাকি বিজ্ঞান বলতে পারে না। আর অবধারিতভাবেই তাদের কাছে একটাই উত্তর- ‘ঈশ্বর’! কিন্তু কোন ঈশ্বর? যথারিতি মুসলিমরা দাবি করছেন ইসলামিক ঈশ্বর আল্লাহর, খ্রিস্টানেরা দাবি করছেন বাইবেলীয় ঈশ্বর শীগুর, আর ইহুদিদের দাবি করছেন জোহোভার। এই হচ্ছে তাদের হকিং এর বিরুদ্ধে ‘একজোট’ হবার নমুনা। নীচের কার্টুনটি তো ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে-



চিত্র-৪: কার্টুন- ‘মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে ঈশ্বরের কোন ভূমিকা নেই’ হকিং-এর এই উক্তির বিরুদ্ধে ধর্মবাদীরা একজোট।

হকিং-এর বইটি নিয়ে লন্ডন টাইমসের নিবন্ধটির পর অভিজ্ঞ রায় মুক্তমনায় কৌতুক করে লিখেছিলেন যে, এপলোজিস্টদের জন্য খারাপ খবরের সংখ্যা প্রতিদিনই বেড়ে চলছে। প্রতিদিনই একটা করে নতুন বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ঘটে, আর ধার্মিকদের ‘গড়’ এর আকার ক্রমশ সংরুচিত হয়ে পড়ে। উইলিয়াম প্যালে ১৮০২ সালে প্রকাশিত বই ‘Natural Theology, or Evidence of Existence and Attributes of the Deity, collected from the Appearances of Nature’ এর মাধ্যমে যে ‘ডিজাইন আর্গুমেন্ট’ বা সৃষ্টির পরিকল্পিত যুক্তির অবতারণা করেছিলেন ডারউইনের বিবরণ তত্ত্ব এসে সেই ডিজাইন আর্গুমেন্টকে বাতিল করে দিয়েছিল সত্ত্বেও বছরের মধ্যেই। তারপর যত দিন গেছে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ইতিহাস মানে জ্ঞানের ফাঁক-ফেঁকার থেকে ঈশ্বরকে হটানোরাই ইতিহাস- ‘গড় ইন গ্যাপস্’ এবং ‘আর্গুমেন্ট ফ্রম ইগনোরেন্স’ থেকে মুক্তির প্রচেষ্টাই বলা যায়। এ বছর (২০১০) ক্রেগ ভেন্টের তার গবেষণায় দেখিয়েছেন ক্রিয়মভাবে প্রাণের সৃষ্টি করাও আজ আর বিজ্ঞানীদের আয়ত্তের বাইরে নয়। ভেন্টের প্রাথমিকভাবে ইস্ট থেকে ক্রোমোজমের বিভিন্ন মাল মশলা সংগ্রহ করেছিলেন, আর ক্রোমোজমের পূর্ণাঙ্গ রূপটি কম্পিউটারে সিমুলেশন করে বানিয়েছিলেন একটি ব্যাকটেরিয়ার জিনোমের অনুকরণে [১৪]। ক্রেগ ভেন্টের এই প্রতিহাসিক আবিষ্কারের পর পরই অভিজ্ঞ রায় মুক্তমনায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন ‘অবশেষে মানুষের ঈশ্বর হয়ে ওঠা: তৈরি হল প্রথম ক্রিয় প্রাণ’ শিরোনামে [১৫]। ডারউইন থেকে শুরু করে আজকের ডকিপ্রের ক্রমিক প্রচেষ্টায় জীববিজ্ঞানের কাঠামো থেকে ঈশ্বর হটে গেলেও মহান ঈশ্বর একটা অঙ্ককার গুহা খুঁজে পেয়েছিলেন পদার্থবিজ্ঞানের তথাকথিত ফাইল টিউনিং, নরসদৃশ যুক্তিমালা (anthropic arguments) এবং সর্বোপরি হকিং এর ‘মাইগু অব গড়’-এর মধ্যে। বড়ই দুর্ভাগ্য, সেখান থেকেও ঈশ্বরকে ক্রমশ হটে যেতে হচ্ছে। সেজনাই লন্ডন টাইমসে লেখা হয়েছে [১৬]-

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ঈশ্বরের জন্য কোন জায়গা আর খালি রাখেনি, স্টিফেন হকিং এর উপসংহার এটাই। যেভাবে ডারউইনবাদ জীববিজ্ঞানের চৌহদি থেকে ঈশ্বরকে সরিয়ে দিয়েছে, বিটেনের সবচেয়ে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ঠিক সেরকমভাবেই মনে করেন, পদার্থবিজ্ঞানের নতুন তত্ত্বগুলো ঈশ্বরের ভূমিকাকে অপাঙ্গক্তেয় করে তুলেছে।

‘গ্রাও ডিজাইন’ বইটি প্রকাশের কিছুদিন আগে এবিসি নিউজের একটি সাক্ষাৎকারে স্টিফেন হকিংকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো ধর্মান্বিত আর বিজ্ঞানের এই লাগাতার সংঘাতে কে জরী হবে? হকিং এর দ্বিধাজন উত্তর ছিল- ‘সায়েস উইল উইন’! হকিং সেই সাক্ষাৎকারে পরিষ্কার করেই বলেছেন,

ধর্ম আর বিজ্ঞানের মধ্যে একটি পরিকার জায়গায় পার্থক্য আছে। ধর্ম মূলত ঐশ্বী বাণী আর রিলিজিয়াস অথরিটির উপরই নির্ভরশীল, আর বিজ্ঞান নির্ভর করে যুক্তি আর প্রমাণে। শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানই জয়ী হবে, কারণ বিজ্ঞানের এই পদ্ধতিটাই উৎকৃষ্ট বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বইটি প্রকাশের পর পর 'ল্যারি কিং লাইভ'-এ সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন হকিং। সেখানে তাকে ধর্ম ও বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে একই ধরনের উত্তর দেন তিনি [১৭]-

বিজ্ঞান ক্রমশ সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে শুরু করেছে, যা এতোদিন কেবল ধর্মের এখতিয়ারের মধ্যে ছিল। বিজ্ঞান নিজেই আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। ধর্মতত্ত্বের প্রয়োজন তাই ফুরিয়েছে।

হকিং-এর এ উত্তর পেয়ে ল্যারি পুনরায় জিজেস করেছিলেন-

-তাহলে কি দীর্ঘ নেই?

-হয়তো থাকতে পারেন, কিন্তু মহাবিশ্বের সৃষ্টিতে তার কোন ভূমিকা নেই।-এই ছিলো স্টিফেন হকিং এর উত্তর!

নিঃসন্দেহে স্টিফেন হকিংয়ের এ এক সাহসী পদযাত্রা। আর সে হিসেবে 'গ্রাও ডিজাইন' আবির্ভূত হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম উচ্চাভিলাসী একটি গ্রন্থ হিসেবে।

স্টিফেন হকিং শুধু প্রথাগত ধর্মতত্ত্বেরই নয়, মৃত্যুঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছেন প্রথাগত দর্শনের। তিনি বইয়ের শুরুতেই তার পাঠকদের ধাক্কা দিয়েছেন এই বলে (পৃষ্ঠা ৫)-

ফিলোসফি ইঞ্জ ডেড।

এটি হকিং-ত্বোডিনোর বইয়ের আরেকটি স্মরণীয় এবং আলোচিত উদ্বৃত্তি। লেখকদের মতে, দার্শনিকরা নন, বরং বিজ্ঞানীরাই আজ গহীন আঁধারে উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। আজকের দিনে কয়েকজন বিখ্যাত বিজ্ঞানের দার্শনিকের নাম বলতে বললে হকিং, ওয়াইনবার্গ, ভিট্টের স্টেঙ্গের, ডকিস - এদের কথা সবার আগেই চলে আসে। এরা কেউ কিন্তু প্রথাগত দার্শনিক নন, তবুও দর্শনগত বিষয়ে তাদের অভিমত ইদানিং যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। একটা সময় দর্শন ছিল জ্ঞান চর্চার মধ্যমণি। প্রকৃতিবিজ্ঞান বিশেষ করে পদার্থবিদ্যা শুধু প্রবেশ করেনি, দর্শনকে প্রায় স্থানচ্যুত করে দিয়েছে। অধিবিদ্যা জানতে হলে তো এখন আর 'স্পেশাল' কোন জ্ঞান লাগে না। কেবল ধর্মের ইতিহাস, নদনতত্ত্ব আর ভাষার মধ্যে আশ্রয় নেয়া ছাড়া আর কোন পথ পায়নি আধুনিক অধিবিদ্যা। অন্যদিকে, আধুনিক পদার্থবিদ্যা আজকে যে জায়গায় পৌছেছে- সেটি অধিবিদ্যার অনেক প্রশ্নেরই উত্তর দিতে

পারে। মহাবিশ্বের উৎপত্তি আর পরিণতি নিয়ে একজন দার্শনিকের চেয়ে অনেক শুদ্ধভাবে বক্তব্য রাখতে সক্ষম হবেন একজন হকিং কিংবা ওয়াইনবার্গ। ডিজাইন আঙ্গমেন্ট নিয়ে অধিবিদ্যা জানা পদ্ধতির চেয়ে বিজ্ঞান থেকেই অনেক ভাল দৃষ্টান্ত দিতে পারবেন ডকিস বা শন ক্যারল। আজকে সেজন্য মহাবিশ্ব নিয়ে যে কোনো আলোচনাতেই পদার্থবিজ্ঞানীদেরই আমন্ত্রণ জানানো হয়, এরিস্টলের ইতিহাস কপচানে কোন দার্শনিককে কিংবা সনাতন ধর্ম জানা কোন হেড পদ্ধতিকে নয়। মানুষও বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে নানা রকমের দর্শনের কথা শুনতে চায়, তাদের কথাকেই বেশি শুরুত্ব দেয়। গ্রাউন্ড ডিজাইন বইয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে - সনাতন দর্শনের প্রয়োজন দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে, আর তার স্থান নিতে চলেছে আধুনিক বিজ্ঞান! হকিং তাঁর বইয়ে সরাসরি অভিমত ব্যক্ত করেন দর্শন এবং আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে এভাবে (পৃষ্ঠা-৫)-

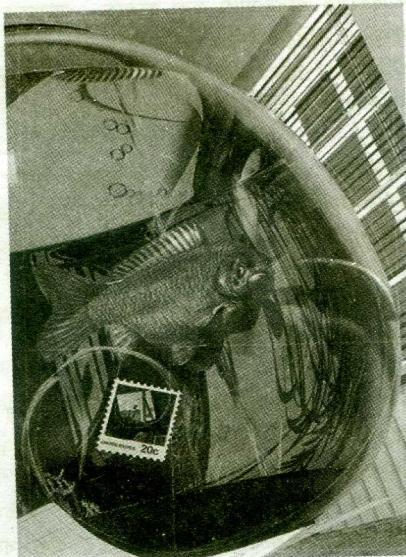
আগে আমাদের এবং মহাবিশ্বের অস্তিত্বের সাথে জড়িত প্রশ্নগুলো কেবল দর্শনশাস্ত্রের সমস্যা হিসেবে গণ্য হত। কিন্তু দর্শনের মৃত্যু হয়েছে। দর্শনশাস্ত্র বিজ্ঞানের বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সমানে পাল্লা দিয়ে চলতে পারেনি। আজকে বিজ্ঞানীরাই বরং নতুন জ্ঞানের অন্বেষণে সফল পথপ্রদর্শক।

হকিং-এর উক্তির বাস্তব প্রতিফলন আঘাত পাই জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখকদের পরিসংখ্যানেই। আজকে বিজ্ঞানের দর্শনের উপর লেখা সাম্প্রতিক বইগুলো, যেমন -‘গড-দ্যা ফেইল্ড হাইপোথিসিস’, ‘গড ডিলুশন’, ‘নিউ এথিজিম’, ‘মাইন্ড অব গড’ থেকে শুরু করে ‘গ্র্যান্ড ডিজাইন’-র মত বইগুলো লিখছেন ভিড়টর স্টেঙ্গের, রিচার্ড ডকিস, পল ডেভিস কিংবা স্টিফেন হকিং - এর মতো বিজ্ঞানীরাই। এ থেকেই সাম্প্রতিক ধারাটি উপলব্ধি করা যায়। এরিস্টল, সক্রেটিস, স্পিনোজা, কান্ট, রাসেলের ঐতিহ্যের কি দৃঢ়জ্ঞক পরিণাম, ভাবা যায়? [১৮]

সম্পূর্ণ বইটি পড়লে পাঠকেরা আরো দেখবেন, 'দর্শনের মৃত্যু ঘটেছে' বলে বইটি শুরু করলেও, দর্শন নিয়েই লেখকেরা কথা বলেছেন বইটির অধিকাংশ জায়গায়। সাদা চোখে ব্যাপারটা স্ববিরোধী মনে হতে পারে। আসলে তা নয়, স্টিফেন হকিং দর্শনের সমস্যাগুলোকে দেখতে চেয়েছেন একজন পদার্থবিজ্ঞানীর চোখ দিয়ে। আগেই বলেছি, তাঁর মতো পদার্থবিজ্ঞানীরাই আজকের দিনের বিজ্ঞানের দার্শনিক। স্টিফেন হকিং চিন্তার বাঁকুনি দিয়েছেন দর্শনের অনেক বিষয়েই, পদার্থবিজ্ঞান থেকে পাওয়া সাম্প্রতিক জ্ঞানের নিরিখে। তার মধ্যে একটি প্রচুর আলোচিত বিষয় হলো -

বাস্তবতা বা রিয়ালিটির ধারণা। হকিং-এর মতে আলাদাভাবে বাস্তবতা কি সেটা বলার কোন অর্থ হয় না; আমরা

বলতে পারি সেটা হল প্রতিরূপ-কেন্দ্রিক বাস্তবতা (Model dependent realism)। হিংস্র তাঁর বইয়ে গোল্ডফিশ মাছের একটি মজার উদাহরণ দিয়েছেন। ধরুন, আপনার বাড়ির কাঁচের জারে একটি গোল্ডফিশ আছে। গোল্ডফিশ জারের পানির মধ্যে আজীবন তার চোখ দিয়ে পৃথিবীর বা চারপাশের যে বাস্তবতা দেখছে, আপনার বাস্তবতা তা থেকে অনেকটাই আলাদা। কিন্তু আপনি কি হলফ করে বলতে পারবেন যে আপনার দেখা বাস্তবতাই ‘প্রকৃত বাস্তবতা’? আমরাও যে গ্যাসের জারে রাখা গোল্ডফিশের মতো একটি গোল্ডফিশ নই, সে সম্মতে কি আমরা নিশ্চিত?



চিত্র-৫: কাঁচের জলাধারে রাখা একটি গোল্ডফিশ আজীবন তার চোখ দিয়ে পৃথিবীর বা চারপাশের যে বাস্তবতা দেখছে, আমাদের বাস্তবতা তা থেকে অনেকটাই আলাদা। কিন্তু আমরাও শেষ বিচারে যে কাঁচের জলাধারে রাখা গোল্ডফিশের মতো এক-একটি গোল্ডফিশ নই, সে সম্মতে কি আমরা নিশ্চিত?

একটি ব্যাপার এখানে বুঝতে হবে। যে বাস্তবতাই হোক, আমরা কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা অনুধাবন করি আমাদের মন্তিষ্ঠ কোম্বের সাহায্যে। আর মানব মন্তিষ্ঠ তৈরি হয়েছে দীর্ঘদিনের বিবর্তনীয় পথপরিক্রমায়। মন্তিষ্ঠকে যদি বিবর্তনীয় পথে সৃষ্ট একটি তথ্য-প্রক্রিয়াজাত যন্ত্র হয়ে থাকে, স্বাভাবিক নিয়মেই সেই যন্ত্রের কিছু ক্রটি থেকে যাবে (যেরকম ক্রটি অন্য সব যন্ত্রেই থাকে)। এই ক্রটিযুক্ত জৈবিক যন্ত্রের সাহায্যে পরিপূর্ণ বাস্তবতাটা কি- সেটা বলাৱই কোন অর্থ হয় না। যেটা আমরা বলতে পারি- মডেল বা রূপকল্প নির্ভর বাস্তবতা। আর মজার ব্যাপার হচ্ছে- এম থিওরি যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে বাস্তবতা আসলে একটি নয়, অনেকগুলো- এবং অনেক সময়ই তা পরিস্থিতি-নির্ভর হতে পারে। তিনি তাঁর বইয়ে বাস্তবতা প্রসঙ্গে বলেন (পঃ- ৪২):

কোনো চিত্র- বা তত্ত্ব-অনির্ভর বাস্তবতার অস্তিত্ব নেই। আমরা বাস্তবতার যে ধারণাটা গ্রহণ করব সেটাকে বলব রূপকল্প-নির্ভর বাস্তবতা; এ ধারণা অনুযায়ী ভৌত তত্ত্ব এবং বিশ্বচিত্র হচ্ছে একধরনের রূপকল্প বা মডেল (সাধারণত গাণিতিক) যেখানে একগুচ্ছ নিয়ম এ কাঠামোর বিভিন্ন অংশের সাথে পর্যবেক্ষণের একটি যোগসূত্র তৈরি করে। এই রূপকল্প কেন্দ্রিক বাস্তবতাই হচ্ছে সেই কাঠামো যার সাহায্যে আধুনিক বিজ্ঞানকে বোৰা যায়।

স্টিফেন হকিং আমাদের জোরালো একটি ধাক্কা দিয়েছেন ‘স্বাধীন ইচ্ছা’ নিয়েও। হকিং তাঁর বইয়ে পদার্থবিজ্ঞানের সুত্রের উপর নিয়ে ভেবেছেন আমরা আগেই বলেছি, কিন্তু তার ভাবনাকে তিনি সেখানেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি বলেছেন, এমনকি আমাদের চিন্তাচলনও পদার্থবিজ্ঞানের সুত্রের বাইরে নয়। তাই তিনি ‘স্বাধীন ইচ্ছে’ নিয়ে প্রশ্ন করেন অত্যন্ত যৌক্তিক ভাবেই [১৯]:

মানুষ কি স্বাধীন ইচ্ছা করতে সক্ষম? আমাদের যদি মুক্ত-ইচ্ছা থেকেই থাকে তাহলে বিবর্তনের ঠিক কোন ধাপে সেটার উপর হয়েছে? নীল-সুবুজ শৈবাল বা ব্যাটেরিয়াদের কি মুক্ত-ইচ্ছা আছে, নাকি তাদের আচরণ স্বয়ংক্রিয়, বৈজ্ঞানিকভাবে সূত্রাবদ? শুধু বহুকোষী জীবেরই কি মুক্ত-ইচ্ছা আছে, নাকি শুধু স্তন্যপায়ী প্রাণীদের? আমরা ভাবতে পারি যে একটা শিস্পাঙ্গি হয়তো নিজের স্বাধীন ইচ্ছাতেই কলাটা চিবাচ্ছে, বা বিড়ালটা সোফা ছিড়ে কুটিকুটি করছে, কিন্তু তাহলে carhorled ditis elegans নামক গোলক্রমির কথা কী বলব, যেটা শুধু মাত্র ৯৫টা কোষ দিয়ে গঠিত? সে নিশ্চয় কখনো ভাবে না, “ওই যে, ওই মজার ব্যাকটেরিয়াটা আমি এখন মচমচিয়ে থাবো”, কিন্তু দেখা যায় এমনকি তারও নির্দিষ্ট পছন্দ-অপছন্দ আছে এবং নিকটবর্তী অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে সে হয় কোনো অনাকর্ষণীয় থাবারেই সম্ভব হয়, অথবা ছুটে যায় আরো ভালো কিছুর দিকে। এটা কি মুক্ত-ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ? (পঃ:৩১)

মানব মন্তিষ্ঠ তৈরি হয়েছে বিবর্তনের এবং সর্বোপরি পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মকে মেনেই। কাজেই আমরা চাই বা না চাই, আমাদের চিন্তা সেই পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মের মাঝেই হয়তো সীমাবদ্ধ থাকবে, আমরা তা চেষ্টা করলেও অতিক্রম করতে পারব না। সে হিসেবে ‘মুক্তচিন্তা’ বা ‘স্বাধীন ইচ্ছা’ ব্যাপারটা এক ধরনের বিভ্রম বা ইন্দ্রিয়- অন্ততঃ হকিং এর তাই অভিমত। তাই তিনি বলেন:

যদিও আমরা ভাবি যে আমাদের মুক্ত-ইচ্ছার ক্ষমতা আছে তারপরও আগবিক জীববিদ্যার জ্ঞান থেকে জানা যায় সকল জৈব প্রক্রিয়াই পদার্থবিজ্ঞান আর রসায়নের সূত্রাবলি মেনে চলে, তাই তারা ঠিক ততটাই সুনির্ধারিত যতটা সুনির্ধারিত

গ্রহসমূহের কক্ষপথ। স্নায়ুবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণাসমূহ এই ধারণাকেই সমর্পন করে যে আমাদের মন্তিক বিজ্ঞানের পরিচিত সূত্রগুলো মেনেই কাজ করে, এবং আমাদের সব ধরনের কর্মকাণ্ড নির্ধারণ করে, প্রকৃতির নিয়মের বাইরের কোনো অপ্রাকৃত কোন কিছুর হাতে এই নিয়ন্ত্রণ নেই। জাগ্রত অবস্থায় রোগীর মন্তিকে আপারেশন করার সময় এটা দেখা গেছে যে মন্তিকের বিভিন্ন অংশ বৈদ্যুতিকভাবে উদ্বৃত্ত করে রোগীর মধ্যে হাত-পা নাড়ানোর, ঠোট নাড়ানোর, এমনকি কথা বলার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করা সম্ভব। আমাদের সকল আচরণ যদি ভৌত বিধিগুলো দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে তাহলে এখানে ‘স্বাধীন ইচ্ছার অবস্থান কোথায় সে চিন্তা করা দুর্ক্ষ’। তাই দেখা যাচ্ছে, আমরা কিছু জৈব যন্ত্র ছাড়া কিছুই নই, এবং ‘স্বাধীন ইচ্ছা’ শুধুই ‘একটা বিভ্রম’।

‘স্বাধীন ইচ্ছা’ শুধুই একটা বিভ্রম- তার এই মন্তব্য নিঃসন্দেহে অনেক বিতর্কের জন্য দেবে, শুধু ধার্মিকদের মধ্যেই নয়, পাশাপাশি অনেক মুজিচিন্তকদের মাঝেও; এই শক্তিশালী অভিযোক্তিটি বইটিতে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। দার্শনিক অভিযোক্তিটি হল, আমাদের মন্তিক যদি পদার্থবিজ্ঞানের এবং বিবর্তনের নিয়মকে মেনেই তৈরি হয় তবে, আমরা দুর্ভাগ্যবশত সেই নিয়মের ‘কারাগারেই’ বন্দী থাকব, যদিও আমরা সব সময়েই মনে করে যাব আমাদের ‘ফ্রি-উইল’ বা ‘স্বাধীন ইচ্ছে’ জাতীয় কিছু আছে। চিড়িয়াখানায় বা গাছের ডালে বানরকে কলা খেতে দেখা যায় - সেটা আমরা ভাবতে পারি এই বলে যে, স্বাধীন ইচ্ছার জন্যই বানরটি কলা খাচ্ছে - কিন্তু একটু গভীরভাবে ভাবলেই বোঝা যাবে যে বানরটি কলা খাচ্ছে আসলে প্রবৃত্তির বশে যে-প্রবৃত্তি জৈব বিবর্তনীয় পথেই উদ্ভৃত হয়েছে- পদার্থবিজ্ঞানের প্রাণিক নিয়মগুলো মেনেই। মানুষও সেই ধারার ব্যতিক্রম নয়। মানুষের বিভিন্ন কাজগুলি কিন্তু জৈববিবর্তনীয় নিয়ম বা শেষ পর্যন্ত পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম মেনেই হচ্ছে। স্বাধীন ইচ্ছা বলতে যদি দেহ-বিহুর্ভূত কার্যকারণগীয় কোন ক্ষমতাকে বোঝানো হয়- অর্থাৎ, একজন মানুষ কোন কিছুর দ্বারা একেবারেই প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে ‘স্বাধীন ভাবে’ কোন কাজ করতে সক্ষম বলে ভাবা হয়- সেটা আসলে ধার্মিকদের আভার অস্তিত্বে বিশ্বাসকেই ঘূরিয়ে বলা হবে [২০]। বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন লিবেটে আশির দশকে একটি কৌতুহলোদীপক পরীক্ষার মাধ্যমে [২১] দেখিয়েছিলেন যে ফ্রি উইল আসলে একটি বিভ্রান্তি বই কিছু নয় [২২]। স্নায়ুবিজ্ঞানের অতি সাম্প্রতিক গবেষণা থেকেও কিন্তু এই ধারণার সপক্ষে নানা সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। যেমন, ২০০৮ সালের একটি গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে যে, কোন ব্যক্তি সচেতন হবার বা এ সমস্তে কিছু বুঝে উঠার অস্তত ১০ সেকেন্ড আগে থেকেই তার মন্তিক কোন কাজ করে ফেলতে পারে [২৩]। ব্যাপারটা সত্য হয়ে থাকলে ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা ব্যাপারটা সত্যই এক ধরনের বিভ্রম, কিন্তু নিঃসন্দেহে খুব শক্তিশালী বিভ্রম! বস্তুত: ‘স্বাধীন ইচ্ছা’ নিয়ে গ্রান্ড ডিজাইন

বইয়ে হকিং-এর গোছানো চিন্তাভাবনাগুলো মানব মন্তিক নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণারই প্রতিখনি যেন।

গ্রান্ড ডিজাইন বইটির প্রশংসা শুধু নয়, সমালোচনাও হতে পারে বেশ কিছু দিক থেকেই। একটি বড়সর সমালোচনার কথা তো বইটি পড়তে পড়তেই মনে আসতে পারে। হকিং যে সমস্ত তত্ত্বের উপর ভর করে তার ভারী ভারী উপসংহারণগুলো টেনেছেন, সেগুলো বড় বেশি প্রাণিক, অনেক বেশি দুর্গম। বিশেষ করে ‘এম তত্ত্ব’ কিংবা ‘মাল্টিবার্সের’ তত্ত্বগুলো কখনো পর্যবেক্ষণ করে যাচাইযোগ্য কিনা, তা নিয়েও বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। তারপরেও, বলা যায় প্রাণিক এই জ্ঞানগুলো আমাদের জন্য জরুরী। আর নিঃসন্দেহে আজকে যে তত্ত্বগুলো ‘বিপ্লবী’, ‘অবাস্তব’ কিংবা ‘অপ্রমাণিত’ বলে ভাবা হচ্ছে, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে তেমনটি আর মনে নাও হতে পারে। তত্ত্ব দেবার বহু বছর পরে সেই তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রমাণ পাওয়া গেছে- এমন দ্রষ্টান্ত বিজ্ঞানে বিরল নয়। এমন অনেক সময়ই হয়েছে -বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলো যে সময়ে প্রস্তাব করা হয়েছিলো, সে সময় সে তত্ত্বগুলোকে প্রমাণ করার মতো যথার্থ প্রযুক্তি বিজ্ঞানীদের হাতে ছিল না। কিন্তু তা বলে সেই তত্ত্বগুলো অবৈজ্ঞানিক কিছু ছিল না। যেমন, বিখ্যাত ‘হকিং রেডিওয়েশনের’ কথা বলা যেতে পারে। কৃষ্ণগ্রহের থেকে তেজক্ষিয়তার বিচ্ছুরণের যে প্রস্তাব বিগত সতরের দশকে হকিং করেছিলেন (যাকে সাধারণতবাবে এখন ব্ল্যাকহোল ইভাপোরেশন’ হিসেবে অভিহিত করা হয়), তা প্রমাণ করার মতো প্রযুক্তি আমাদের হাতে ছিল না। সম্প্রতি প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে বেশি কিছু প্রমাণ আমরা পেতে শুরু করেছি [২৪]। প্রযুক্তিগত এবং অন্যান্য সীমাবদ্ধতার কারণে এম তত্ত্ব কিংবা অসংখ্য মহাবিশ্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখন পর্যন্ত না পাওয়া গেলেও এগুলো গাণিতিকভাবে সুসংহত। কাজেই ভবিষ্যতে পাওয়া যেতেই পারে এই তত্ত্বগুলোর প্রত্যক্ষ কিংবা, হয়তো, পরোক্ষ কোন আনুষঙ্গিক প্রমাণ [২৫]। হকিং তা খুব ভালভাবেই জানেন। তাই তিনি প্রযুক্তির কালিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষপাতি নন, তিনি বাজি ধরেন ‘সীমার মাঝে অসীম’ সব সমস্যার সমাধানে। তাঁর শেষ দানের বাজি শুধু বিজ্ঞানীদেরই নয়, আন্দোলিত করে ছাপোষা এই আমাদেরও, দলভূটের গানের মতো অনুকরণ তোলে তা আমাদের মনে-

‘তুমি আমার বাহার তাস

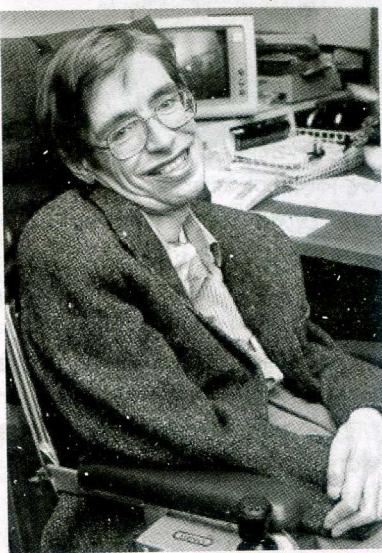
শেষ দানেও আছি

তোমার নামে ধরেছি আমার

সর্বস্ব বাজিতে.....’

তিনি জীবনে বহু কিছু নিয়েই বাজি ধরেছেন, এমনকি নিজের জীবন নিয়েও। ১৯৬৩ সালে ২১ বছর বয়সে যখন তিনি

কেন্দ্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছিলেন, তখনই তাঁর দূরারোগ্য স্নায়বিক রোগ ‘মোটর নিউরন ডিজিজ’ ধরা পড়ে। তাকে বলা হয়েছিলো তিনি বড়জোড় বছর দু’এক বেঁচে থাকতে পারবেন। হকিং হতাশ না হয়ে জীবন নিয়ে বাজি ধরেছেন। আরো বেশি করে পদার্থবিজ্ঞানের প্রাণিক জ্ঞানের সাহায্যে মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচনে নিজেকে নিয়োজিত করছেন। ১৯৬৩ সালের পর থেকে আরো ৪৭ বছর কেটে গেছে। হকিং থেমে থাকেননি, মারাও যাননি। নিজের মননকে আরো দৃঢ় করেছেন, আর আমাদেরও সেই সাথে আলোকিত করেছেন ‘আলোকেরই ঘৰ্ণধারায়’। তার বেঁচে থাকাটাই তো এক অলৌকিক ব্যাপার বলে মনে হয় সাধারণ মানুষের কাছে। কিন্তু হকিং এর কাছে তার ব্যাখ্যা সম্ভবত ভিন্ন, কারণ তিনি আস্থা রাখেন অলৌকিকতায় নয়, বরং বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং সেই সাথে তার প্রবল ইচ্ছাশক্তির উপর। মোটর নিউরন ডিজিজ তার দেহকঠামোকে ছাইল চেয়ারের চৌহদিতে বন্দী করলেও বন্দী করতে পারেনি তার পরিশীলিত মননকে, পারেনি বন্দী করতে তাঁর প্রসারিত চিন্তা চেতনাকে। এ ধরনের রোগে বেঁচে থাকা রোগীদের আমরা যেখানে প্রায়শই দেখি রায় নাম জপে কিংবা ‘আল্লা-বিল্লা’ করে সময় পার করে দিতে, কিংবা মহান স্রষ্টার গুণকীর্তনে, সেখানে হকিং এর ব্যতিক্রমী মনন নিয়ত নিয়োজিত মহাবিশ্বের অস্তিম রহস্যগুলোর যৌক্তিক সমাধানে, আর মহাবিশ্বের রহস্যের হকিং-সমাধানেও স্রষ্টার আদপে কোন ভূমিকাই নেই!



চিত্র-৬: স্টিফেন হকিং- দূরারোগ্য মোটর নিউরন ডিজিজ তার দেহকঠামোকে ছাইল চেয়ারের চৌহদিতে বন্দী করলেও বন্দী করতে পারেনি তাঁর চিন্তাশীল মননকে।

স্টিফেন হকিং তাঁর বইয়ে বিজ্ঞানের এবং দর্শনের প্রাণিক সমস্যাগুলো নিয়ে সাধারণ জনগণের জন্য আলোচনা করেছেন

কোন ধরনের গাণিতিক সমীকরণ কিংবা ভাবগঠীর জটিলতায় না চুকেই। ফলে বইটি হয়েছে গতিশীল কিন্তু থেকেছে ভারমুক্ত। আইনস্টাইন বিজ্ঞানের দুর্জন তত্ত্ব মানুষকে শেখানো নিয়ে বলতেন, ‘তুমি যা শিখেছ তা যদি তোমার দানীকে বুবাতে না পার, তাহলে তুমি আসলে কিছুই শেখোনি’ [২৬]। আমাদের ধারণা, স্টিফেন হকিং-লিওনার্ড স্ট্রেদিনোর ‘গ্যাল্ড ডিজাইন’ পড়লে আইনস্টাইনের এই উক্তির তাৎপর্য খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করবেন পাঠকেরা।

Footnote

[১] আমরা ঈশ্বর শব্দটিকে বাইবেলীয় গড (God) অর্থে ব্যবহার করেছি।

[২] প্রসঙ্গত স্যার আইজাক নিউটন এই পদটি অলংকৃত করেছিলেন তাঁর সময়ে।

[৩] আজ থেকে ১৬ বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ড. অজয় রায় সাইদুর রহমান ফাউন্ডেশন বক্তৃতায় বলেছিলেন “... একদা দর্শন ছিল জ্ঞান চর্চার মধ্যমণি। প্রকৃতিবিজ্ঞান ছিল তার অনুসারী, সহচরী। কিন্তু আজ দিন বলেছে বিষয়ত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব এমন কি অধিবিদ্যার জগতেও প্রকৃতিবিজ্ঞান বিশেষ করে পদার্থবিদ্যা শুধু প্রবেশ করেনি দর্শনকে স্থানচ্যুত করতে উদ্যত। দর্শন এখন ধর্ম, নদন তত্ত্ব আর ভাষার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। এর একটি কারণ হতে পারে প্রকৃতিবিজ্ঞানে যে অভৃতপূর্ব উন্নতি হয়েছে তার সাথে তাল মিলিয়ে চলা দর্শনশাস্ত্রের পক্ষে সম্ভব হয় নি। স্পিনোজা, কান্ট ও রাসেলের কি দৃঢ়খজনক পরিস্থিতি। দর্শন আজ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরে। তার স্থানে আসবে বিজ্ঞান, দর্শনের প্রয়োজন যাবে ফুরিয়ে। ‘বিজ্ঞান ও দর্শন: জড়ের সন্ধানে’ -অজয় রায়, সাইদুর রহমান ফাউন্ডেশন বক্তৃতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪

তথ্যসূত্র

[১] Stephen Hawking, A Brief History of Time, Bantam Dell Publishing Group, 1988

[২] Paul Davies, The Mind of God: The Scientific Basis for a Rational World, Simon & Schuster, 1993

[৩] Sean Carroll, The ‘Why?’ Questions, Chapter and Multiverse, The Wall Street Journal, Online: <http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704358904575477583868221458.html>

[৪] অস্তিত্বের রহস্য, ‘দ্য গ্যাল্ড ডিজাইন’ -স্টিফেন হকিং [অধ্যায় ১], অনুবাদ- তানভীরুল ইসলাম, মুক্তমনা, ১৪ আশ্বিন ১৪১৭ (সেপ্টেম্বর ২৯, ২০১০)।

[৫] অভিজিঙ্গ রায়, আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, (অক্ষুর প্রকাশনী, ২০০৫); মূল বইয়ের সম্মত অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

[৬] অভিজিঙ্গ রায়, আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, পুর্বোক্ত।

[৭] E.P.Tryon, “Is the Universe a Vacuum